# —অতি-আধুনিক—
# বাংলা কথা-সাহিত্য

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

# অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

# অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য *

বাংলা সাপ্তাহিকে, মাসিকে, বার্ষিকে আজকাল ছোটবড় গল্প, উপন্যাস সস্তা হইয়া ছড়াছড়ি যাইতেছে। সম্পাদকদের প্রশ্ন করিলে, প্রবীন যাঁহারা তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন,—"কি করবো বল, গল্প না হ'লে কাগজ তো আর চলে না ;" নবীন যাঁহারা, এবং নিজেদের যাঁহারা তরুণ বলিয়া কাগজে-পত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু উষ্ণ হইয়া বলেন,—"কেন, গল্প-সাহিত্য কি আমাদের সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ নয় ? গল্পের ভিতরই কি মানবজীবনের বিচিত্র ধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না ? গোর্কি, শেকভ, শরৎচন্দ্র কি—" হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় লেখক-যশ-প্রার্থী আমি, নবীন সম্পাদককে চটাইয়া ভাল করি নাই ; সুতরাং মধ্যপথেই তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে হয়,—"হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, আমারই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।"

ট্রামে চলিতে চলিতে দেখি আঠারো কি বিশ বৎসরের দুই যুবক অতি উৎসাহে তর্কে মাতিয়াছে। মনের মধ্যে আপনি কৌতূহল জাগে, কান পাতিয়া শুনি, ট্রামের ঘর্ঘর ও রাস্তার বিচিত্র কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিয়া, মাঝে মাঝে ক্নুট হামসুন্, জোহান্ বোয়ার, ম্যাক্সিম গোর্কির নাম উচ্চারিত হইতেছে। বিস্মিত পুলকে ভাবি এই বয়সে তো আমরা থ্যাকারে, ডিকেন্স্, জর্জ্জ ইলিয়টের যুগও পার হই নাই ; ইহারা সমস্ত অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে সমান-তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, আধুনিক য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিতেছে। আবার নবীন সম্পাদকের কথা মনে পড়ে—বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হৃদয়ে আশা জাগে। কিন্তু যত দিন যায়, মাসিক, সাপ্তাহিকের গল্প ও উপন্যাসগুলি যতই মন দিয়া পড়ি, তাহার মর্ম্মকথার মধ্যে ভাল করিয়া ঢুকিতে চেষ্টা করি, মন ততই নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে, বাংলা কথা-সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে তখন আর খুব বেশী উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতে পারি না। যে কয়টি মাসিক

---

* শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দিল্লী-নগরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

ও সাপ্তাহিক আজকাল হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার একটি নয়, দু'টি নয়, গল্পের পর গল্প পড়িয়া যাই,—মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কি কৃত্রিম ভাব-বিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া-কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল! ইহাই কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য? ইহারই মধ্যে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিচিত্র সমস্যা ও নিগূঢ় রসরহস্য রূপায়িত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছে? তরুণ তরুণীর অসীম প্রেম-তৃষ্ণা, দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃখীজনের করুণ জীবন যাপন, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের শত-সহস্র অধীনতার নিগড় সমস্তই তো কথা-সাহিত্যের অমূল্য ও অপূর্ব্ব উপাদান, কিন্তু যে কল্পনা ( imagination ) ও সহানুভূতি-দৃষ্টি ( sympathetic vision ) থাকিলে, মনের যে প্রসার থাকিলে, এই উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা কোথায়? কথায় কথা গাঁথিয়া, কান্নার মালা দুলাইয়া, নাকি-সুরে বাঁশী ধরিলে তাহাতে ছিঁচ কাঁদুনে আদুরে ছেলের আব্দার প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু প্রেমের নীরব-গোপন গুঞ্জনের যে মৃদু মাধুর্য্য তাহা কি এই ন্যাকামি এবং কাঁদুনে ভাষা-বিলাসের বস্তু? প্রেমের রহস্য কত বিচিত্র, হৃদয়ের গোপন-পথে তাহার যাওয়া-আসা; হৃদয় দিয়া তাহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়, কিন্তু সে জন্য যে শুদ্ধ-সবল চিত্তের প্রয়োজন, যে শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যক, তাহা কোথায়? যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম-বিলাস বাংলার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার চাপে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে ছোটবড় যত গল্প সব এমন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে যে, একটি একটি করিয়া প্রত্যেকটি গল্প তলাইয়া পড়িবার কোন প্রয়োজন হয় না, গ্রীক-পুরাণের "Procrustian Bed"-এর মতন সব গল্পগুলিকেই এক মাপ-কাঠিতে ফেলিয়া পরিমাপ করা চলে। খুব কম গল্পই মনের মধ্যে এমন ছাপ রাখিয়া যায় যে, ছ'মাস পরে তাহার 'প্লট' চেষ্টা করিয়াও স্মরণে আনা যাইতে পারে। মাঝে মাঝে দু'একটি এমন গল্প চোখে পড়ে যাহার মধ্যে হয় তো লেখকের ভাষার 'কেরামতি' কিংবা প্লটের নূতনত্ব কতকটা আবিষ্কার করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে কথা-সাহিত্যের যে আর্ট তাহাকে ধরাও যায় না; শক্তি ও সংযম, কল্পনা ও সত্য-অনুভূতির অভাবে তাহাও অপাঠ্য হইয়া উঠে। মানবচিত্ত ও চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা

থাকিলে, কল্পনার যে প্রসার, অনুভূতির যে গভীরতা থাকিলে আমাদের বাঙালী-জীবনের প্রতি দিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও সাহিত্যের সত্যবস্তু হইয়া উঠে, সুদূর আফ্‌গানিস্থানের "কাবুলীওয়ালা"ও নিতান্ত আপনার জন হইয়া দেখা দেয়,—সেই অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতির কোন পরিচয় নবীন লেখকদের একটি গল্পেও বুঝি ধরা ছোঁয়া যায় না। আধুনিক বাংলা গল্পের নায়ক যে হইবে "অচঞ্চল অগ্নিশিখার" মত হইবে তাহার "দেহযষ্ঠি", "আর্টিষ্টের মতন" হইবে তাহার "লতানো আঙ্গুল", সময়ে অসময়ে ঘরে বাহিরে প্রেমে পড়িতে পারাই হইবে তাহার একমাত্র যোগ্যতা ; আর নায়িকার হইবে "বাঁশীর মত নাক, লাল টুকটুকে গাল, পাত্‌লা ঠোঁট, কোমর-ছোঁয়া কোকিল-কালো চুল," পরণে তাহার থাকিবে "হেলিয়োট্রোপ্‌ রংয়ের সাড়ী," "ফিঁকে নীল রংয়ের ব্লাউস", আর বাজিবে তাহার "চুড়ির রিনিঝিনি" ও "পিয়ানোর টুংটাং"! নিছক কাব্যবিলাসপূর্ণ শুধু কথায় গাঁথা কতকগুলি কাহিনী এবং রসরহস্যবিহীন কতকগুলি সত্যঘটনার বিবরণই যেন অতি-আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই সব গল্পের প্রত্যেকটি নায়ক, প্রত্যেকটি নায়িকা যেন একই ছাঁচে ঢালা, তাহারা সকলেই একই ভাবে চলে, বলে ও অশ্রুজলে গলে, শুধু নামগুলি তফাৎ বলিয়াই কোনোরকমে তাহাদের পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া চিত্তের দুর্ব্বলতা ও ভাবের অসংযম তো প্রত্যেকটি লেখকের সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই সংক্রমণ, যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন, ক্রমশঃ বাংলার তথাকথিত "তরুণ"-দলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে যে বাঙালী শৈশবে লিভারে, যৌবনে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ও বার্দ্ধক্যে ডায়াবেটিজে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিত সেই বাংলার আধুনিক তরুণ-দলের "দোদুল দে" ও "শিহরণ সেন" "ব্যথা-ব্যথা" বলিয়া হা-হুতাশে দেহমনের ক্ষুধাকে ক্ষয়রোগে দাঁড় করাইতেছে অথবা বিষৌষধ পান করিয়া অজানা প্রিয়ার উদ্দেশে আত্মাহুতি দিতেছে! ফল হইয়াছে এই যে, ব্যর্থপ্রেমের ব্যর্থতর কাহিনী সমস্ত কথা-সাহিত্যকে জঞ্জালে ভরিয়া তুলিয়াছে আর যাঁহারা এই সকল কাহিনীর স্রষ্টা তাঁহারা মনে ভাবিতেছেন 'ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতেছি'! কিন্তু কি হাস্যকর ভাবেই না এই সৃষ্টির প্রয়াস সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইতেছে! ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে দুঃখের অনুভূতি জাগাইতে, বড় নৈপুণ্যের, বড় লিপিকৌশলের দরকার। প্রেম ব্যর্থ হইলেই কিম্বা বিচ্ছেদের

হয় না ; ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতে হইলে দেশ কাল ও পাত্রের একটা ওজন ও সুসঙ্গতি রক্ষার দরকার। সর্ব্বোপরি পাঠকের মনের প্রত্যেকটি গোপন কোণের সহিত লেখকের মনের সংযোগ না থাকিলে, কি ভাবে কথাটি বলিলে, কি ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিলে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী বাজিবে, সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও সম্যক জ্ঞান না থাকিলে খুব ওস্তাদ শিল্পীর হাতেও 'ট্র্যাজেডি' জমিতে পারে না। আর এ কথা আমাদের কথা-সাহিত্যের লেখকদিগকে কে বলিয়া দিবে যে, দুঃখের মধ্যেও সংযম চাই, গাম্ভীর্য্য চাই ; ব্যথা যেখানে গভীর হয়, যত করুণ হয়, এবং তাহাতে যতটা শান্তশ্রী ফুটিয়া উঠে, বিষাদের সত্য প্রতিমূর্ত্তি, আর্টের সৌন্দর্য্য সেইখানেই তত আত্মপ্রকাশ করে, ব্যথার পূজা সেইখানেই সার্থক হয়।

প্রেম সাহিত্যের সত্য ও সনাতন বস্তু। এই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্য রসে ও সৌন্দর্য্যে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেম যদি আজ বাংলার নব-কথা-সাহিত্যের মূলে রস জোগায় তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই বরং তাহার শক্তিমান বিকাশে উৎফুল্ল হইবারই যথেষ্ট কারণ আছে। সেই প্রেম যদি তরুণ চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া সাহিত্যে সৌন্দর্য্য ও অভিজ্ঞতার রসে ও রহস্যে প্রতিবিম্বিত হয়, তবে তো সেই প্রেম, সম্মানে ও মর্য্যাদায় অভিষিক্ত হইয়া তারুণ্যকে জয়যুক্ত করে। কিন্তু বাংলার নব-কথা-সাহিত্যে তাহার পরিচয় কোথায়? নর-নারীর প্রেমের একটা রক্তমাংসের দিক আছে এ কথা জানি, এবং সে দিকটা যে অবহেলার জিনিষ নয় সে কথাও মানি। কিন্তু যে প্রেম-কাহিনীর মধ্যে ঐ রক্তমাংসের সম্বন্ধের কথাই একান্ত হইয়া দেখা দেয়, হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ভাব ও ভাষার বিলাসে আত্ম-হত্যা করে, সাহিত্য-রচনা সেখানে আর্টের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। যাহা স্থূল, যাহা অসুন্দর, যাহা লোভে ও মোহে অশুচি, জীবনে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর্টে তাহা সত্য কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ আর্ট শুধু জীবনে বিধৃত হইয়া নাই, আর্টের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে জীবনকে অতিক্রম করিয়া। মানুষের জীবন যাহাকে ধরিতে পারে না, ছুঁইতে পারে না, রক্তমাংসের সমস্ত আকুতি দিয়া যাহার পাদসীমায়ও পৌঁছিতে পারে না, আর্টিষ্টের চিত্ত কল্পনা দিয়া, অনুভূতি দিয়া সেই সুদূরের রাজ্যেই বিহার করে এবং শুধু বিহার করে না, তাহারই মধ্যে আপন সৃষ্টির

অনুভূতির রসাস্বাদানের আভাস যে লেখক তাঁহার প্রেমকাহিনীর মধ্যে দিতে পারেন তাঁহাকেই বলিব প্রকৃত আর্টিষ্ট। প্রেমের গল্প যদি শুধু আমাদের চারিপাশের নর-নারীর প্রেমকাহিনীর প্রতিবিম্ব হয় তাহা হইলে তাহাকে কাহিনী মাত্র বলিতে পারি কিন্তু সাহিত্য বলিতে পারি না, আর্ট বলিতে পারি না। অথচ আজিকার দিনের বাংলা কথা-সাহিত্যে হইয়াছে তাহাই। প্রেমের গল্পমাত্রই হইয়াছে একশ্রেণীর তরুণতরুণীর প্রেম-বিলাসের অথবা অতৃপ্ত দৈহিক বুভুক্ষার প্রতিবিম্বমাত্র; তাহার মধ্যে না আছে কোন কল্পনা, না আছে কোন সত্যানুভূতি, না আছে সুস্থ ও শক্তিমান প্রকাশ। প্রেম কি শুধু মানুষকে বিলাসের বধ্যভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া লালসার যূপকাষ্ঠে তাহাকে বলি দিবার জন্যই আধুনিক বাংলার কথা-সাহিত্যের সিংহাসনে আসিয়া আসন লইয়াছে? একেই তো দুর্ব্বল, শক্তিহীন বাংলা, তাহাকে আরো দুর্ব্বল, আরো শক্তিহীন করিয়া তুলিবার জন্যই কি বাংলার 'তরুণ' লেখকেরা জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন? শুনি তাঁহারা জীবনকে ভালবাসেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে "সবার উপরে সত্য" বলিয়া জানেন, কিন্তু সব ভালবাসা, সব জানা যে ব্যর্থ হইয়া যায়, অপমানে ক্ষুব্ধ হয়—যদি প্রেম সেই সম্বন্ধকে স্বাস্থ্যবান করিয়া না তোলে, চিত্তকে সঞ্জীবিত ও সুস্থ না করে। গল্প লিখিতে বসিয়া লেখক নীতিশতক আওড়াইবেন, আর্টিষ্ট শুকদেব গোস্বামীর আসন লইবেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না; সাহিত্যের দিক হইতে, আর্টের দিক হইতেই বলিতেছি—অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা কখনও প্রেমের উপাদান হইতে পারে না, সর্ব্বোপরি কখনও শিল্পে বা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। প্রেম ব্যর্থ হইলে তরুণ চিত্তকে ব্যথায় পীড়িত করে এ কথা সত্য, সে ব্যথার উপরে সহজে জয়ী হওয়া যায় না সে কথাও সত্য, কিন্তু এই সুদুঃসহ ব্যথা যদি দেহমনকে অসুস্থ করিয়া তুলে, বিষবাষ্পে সমস্ত অন্তরকে ভরিয়া দেয় এবং চিত্তের শুচিতা ও সংযমকে ভ্রষ্ট করে, তবে সে প্রেমের মর্য্যাদা রহিল কোথায়? আর নীতির কথাই যদি বলি তাহাতেই বা ভয় পাইবার কি আছে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যেখানে যত নিবিড়, যত জটিল, যত বেদনাপরিপ্লুত সেইখানে তো কোন না কোন নীতি নিহিত থাকিবেই; কবি যিনি, লেখক যিনি, শিল্পী যিনি, তিনি সে সম্বন্ধকে সমস্ত জটিলতা ও মলিনতা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে মঙ্গলে ও সুন্দরে জয়যুক্ত করিবেন। শুধু

তবে প্রেম তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া ? প্রেম যদি তপস্তার অনলে পুড়িয়া শুদ্ধ সংযত না হয় তবে যে বারবার তাহাকে দুষ্মন্তের রাজসভা হইতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। সতেরো বৎসর বয়সেই যে অজাতশ্মশ্রু তরুণের—"একটুখানি সাড়ীর আঁচল দেখ্‌লেই বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোন্‌বার জন্যে মনটা তৃষিত হ'য়ে থাকে এবং কাঁচাবয়সের মেয়ে দেখ্‌লেই ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে হয়," তাহার দেহমনের স্বাস্থ্য যে অটুট আছে এ কথা কি করিয়া বলিব ? সতেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকে লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, সেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই এ কথা কে স্বীকার করিবে ? অথচ এই বিকৃত, বিষদুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই তো অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইতেছে! যে তারুণ্য ভৎসিত হইলে এখনও শৈশবের মাতৃদুগ্ধ উদ্গীরণ করে সে তারুণ্যের উপর এই বিকৃত প্রেমের প্রভাব কি করিয়া বিস্তৃত হইল তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। এক একবার মনে হয় অভিভাবকের শাসন-কশার অভাবে বাংলার এই অকালপক্ক তারুণ্য কি বল্গাবিহীন তুরঙ্গের মত পথ হারাইয়া পিচ্ছিল পঙ্কে পদস্খলিত হইয়া মরিবে ? এই দুর্ব্বল, অস্বাভাবিক ও বিকৃত মনস্তত্ত্বের নিদান আবিষ্কার করিতে সক্ষম বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু।

নারীরূপের একটা মোহ আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্ব্বদাই লালসায় পঙ্কিল ? তাহা কি কখনো সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ নয় ? ভদ্রসমাজে অবাধ-গতি মাসিকের পাতা খুলিয়া যখন পড়ি,—"উত্তেজনার ফলে সে একটু একটু কাঁপ্‌ছিল, ওর বুক তীব্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুল্‌ছিল—এক এক-বার ফুলে' ফুলে' উঠে' ব্লাউসের নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের সীমা প্রায় অতিক্রম 'ক'রে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল পাত্র বেয়ে সুরা উছ্‌লে পড়তে চাচ্ছে",—তখন কি মনে হয় না যে প্রেমের শান্তশ্রী, স্নিগ্ধ অনুভূতি কর্দ্দমের পঙ্কিলতার মধ্যে বিসর্জ্জিত হইয়া, চিত্তের সমস্ত শুচিতা ও সংযম অন্তর্হিত হইয়া, শুধু দৈহিক ভোগের তৃষ্ণা ও রক্তমাংসের বুভুক্ষাই একান্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া মরিতেছে এবং তাহারই মধ্যে আত্মপরিতৃপ্তি কল্পনা ও কামনা করিতেছে ? নর-নারীর যে সহজ, স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেম, তাহার মধ্যে জীবনের যে গভীরতর অর্থ, ব্যাপকতর সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে তাহাকে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস—

রচনার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। প্রকৃতির নির্দ্দেশ যাহা তাহা তো মানুষ পালন করিবেই, সম্ভোগের তৃষ্ণা, দেহের ক্ষুধা সে তো মিটাইবেই, কিন্তু ঐখানেই তাহার শেষ নয়, শেষ হইতে পারে না; শুধু ঐ কথা লইয়াই যিনি সাহিত্যে আসর জমাইতে বসেন, তিনি শুধু জঞ্জালকে বাড়াইয়া তোলেন, আর্টের ত্রিসীমানায় তাঁহার স্থান নাই। এই তৃষ্ণা, এই বুভুক্ষাকে অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির নির্দ্দেশের উপর জয়ী হইয়া, মানুষের চিত্ত সর্ব্বদাই অজানা অপূর্ব্ব মহীয়ান্ মানবত্বের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে। এই দরশন-পরশন জগতের বাহিরে, সেই অজানার উদ্দেশে যাত্রার যে ইঙ্গিত ও আভাস তাহাই যেখানে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার, আচারব্যবহারের, চলাফেরার, কথাবার্ত্তার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেইখানেই বুঝি আর্ট ও সাহিত্য আপন সত্যকার সত্ত্বা খুঁজিয়া পাইয়াছে। "মানুষের মানে চাই" বুঝিলাম, বুঝিলাম মানুষকে তাহার সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু মানুষ শুধু প্রকৃতির নির্দ্দেশকেই মানিয়া চলিবে, তাহার উপর জয়ী হইবে না, শুধু রক্তমাংসের ক্ষুধাকেই পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাকে অতিক্রম করিবে না, সৌন্দর্য্য সম্ভোগেই মজিয়া থাকিবে, সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিবে না, ইহাই কি হইল "মানুষের মানে"? সমস্ত দুঃখ-বেদনা, সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ যে আপনার চেতনাকে কল্যাণতর, উন্নততর আদর্শে জাগরিত রাখে তাহার কি কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই?

তর্ক উঠিবে—"আমরা কথা-সাহিত্যে বাস্তবতার স্থষ্টি করিতেছি—এবং তাই বলিয়াই নর-নারীর প্রেমের এই নিতান্ত স্থূল দিকটাই আমাদের চোখে পড়িয়াছে।" শুনিয়াই বুঝিতে পারি, বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপীয় Realism ও realistic interpretation of life-এর ধুয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, আর দুলায়ো না সমীরে সমীরে, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়"—ভাল কথা। কিন্তু এই বাস্তবতা বলিতে "তরুণ" সাহিত্যিকেরা কি বুঝিয়াছেন? বাস্তবতা বলিতে কি তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টির কিংবা অনুভূতির গোচরে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহারই হুবহু নিখুঁত চিত্রাঙ্কন? এবং তাহাই কি হইবে আর্ট? আমরা দশজনে প্রতিদিন ঘরে-বাহিরে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার সঠিক বিবরণই যদি সাহিত্য হইত তবে তো আমাদের প্রায় সকলেরই সাহিত্যিক বলিয়া মান্য না হউক অন্ততঃ গণ্য হইবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিত না, কিন্তু সুখের বিষয় সাহিত্যে

যাহাকে বাস্তবতা ( Realism ) বলা হয় তাহার অর্থ ইহা নয়। বাস্তব-সাহিত্য বলিব তাহাকেই যাহা আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের, প্রতিদিনের ঘটনার ছায়াচিত্রকে প্রতিবিম্বিত মাত্র করে না; সেই ঘটনার অন্তরালে, সেই ছায়াচিত্রের পশ্চাতে মানবজীবনের সুখ দুঃখের বিচিত্র ইতিহাসের মর্ম্মকথা, বিপুল সমস্যার অভিব্যক্তি, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রের সন্ধান,—এ সমস্তকে কল্পনা, সত্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। য়ুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের যাঁহারা প্রধান পুরোহিত, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই মানবজীবনের বা সমাজের একটা বিশিষ্ট সমস্যা ও তাহার সমাধানকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাতেই তাঁহাদের চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বাংলার কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবতার ধুয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে এই প্রয়াস কোথায়? আমরা বাস্তবতা বলিতে বুঝিয়াছি, মানুষের আপাত-বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে যাহা অভিভূত করে, চিত্তকে সহজে নাড়া দেয়, তাহার স্থূল ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ বা বড়জোর একটা সমস্যার ইঙ্গিত!

তবে বাস্তব-সাহিত্যের ভিত্তি কি? মানুষের ব্যক্তি, ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে যখন কোন একটা বিশেষ সমস্যা একান্ত হইয়া দেখা দেয় তখন সেই সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ যুগের একটা বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে, উনবিংশ-শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য জগত যে সমুদয় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া হয় তো য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাংলার নব-"রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্যের কতকটা মিল আছে, কারণ নানা দিক দিয়াই বাঙালীজীবনে এবং সমাজে কতকগুলি সমস্যা আজকাল বেশ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া যদি আমাদের এই বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া থাকে তবে তাহা সময়োপযোগীই হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্যাগুলি লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা দরকার, তাহার বিস্তার ও গভীরতা কতখানি, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত, ইঙ্গিতে ও আভাসে কতটুকু ব্যক্ত হইতেছে; জানা প্রয়োজন তাহার প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের নিগূঢ় মর্ম্ম-কথার ভাব ও ভাষা। "রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্য সৃষ্টি করা ছেলে-খেলা নয়; তাহার মধ্যে একটা বিপুল দায়িত্ব লেখকের আছে, তাহা ছাড়া সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি, সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা,

মনের উদার প্রসার, এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু নবীন লেখকদের কয়জন এই শক্তি লইয়া এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন? সেই শিক্ষা ও সাধনা তাঁহারা কোথায় অর্জ্জন করিয়াছেন? আমাদের এই নব কথা-সাহিত্যের "রিয়ালিজম্" আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানী করিয়াছি, সেখানকার সাহিত্য হইতে এই পরগাছাটি রস ও জীবনীশক্তি আহরণ করিতেছে। তাহার শক্তি তাই ক্ষীণ, তাহার গতি তাই আড়ষ্ট এবং অসুস্থতায় তাই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত। সুদুঃসহ সাধনায়, দুঃখের নিদারুণ দহনে য়ুরোপের শিল্পীরা যে বাস্তবতার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিলেন আমরা তাহাকে লাভ করিতে চাহিলাম শুধু তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া, শুধু পরের মুখে ঝাল খাইয়া। ফল যাহা হইয়াছে তাহাতে আর কিছু হইলেও বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই।

বাস্তবতার এই ঢেউ আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনের যে অংশ একই সঙ্গে করুণ ও কদর্য্য, অত্যাচারে পিষ্ট ও জর্জ্জরিত, দেহ ও মনের অস্বাস্থ্যে মৃতপ্রায় তাহা যদি আজ বাংলার তরুণ লেখকদের চিত্তে সমবেদনা ও সহানুভূতির সুর জাগাইয়া থাকে, তাঁহারা যদি আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলিকে বিচিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এই সব সমস্যাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা যদিও বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছেন, হৃদয় দিয়া, অনুভূতি দিয়া এই সমস্যাকে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে কেহই করেন নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাহার ফলে এক ধরণের বাস্তব গল্প শুধু বাহিরের জিনিষ—কুলী ধাওড়া, কামিনদের বস্তী, ছেঁড়া চট্, দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা, পঙ্কিলময় পথ, অস্বাস্থ্য, কলহ—লইয়াই আরম্ভ ও শেষ হইল, ইহাদের অন্তরালে মানব-মনের ও প্রাণের যে শাশ্বতলীলা সকল দৈন্য ও কুশ্রীতার উপরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহার কোন সন্ধানই দিতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে দু' একটি ছাড়া কোনটিতেই অন্তর্দৃষ্টির

নর-নারীদের জীবনের পরিচয় জানিতে হইলে, ইহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে, ইহাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া ইহাদেরই মধ্যে জীবনযাপন একান্ত প্রয়োজন, যদিও বর্ত্তমানকালে এ শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির যিনি অগ্রদূত, সেই মনীষী গোর্কি শ্রমজীবিদের মধ্যে, কয়লার খাদে, জঘন্ত বস্তীতে জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। এই দুঃখের দহনে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহার মূল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু শুধু এই অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নহে,—যদি তাহার সঙ্গে সমস্ত সমস্যাটিকে অন্তরের মধ্যে বুদ্ধি দিয়া, হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিবার ও যথোচিত ভাবে ও ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকে। এ কথা ভুলিলে কোন মতেই চলিবে না যে, কেবলমাত্র বস্তুর অভিজ্ঞতাই আর্টের মর্য্যাদা পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সঞ্চয় করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার গল্পে যে ভাবে তাহাকে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবতার অভাব আছে এমন অভিযোগ এক বস্তুতন্ত্রবাদী ছাড়া আর কেহ করিতে সাহস পাইয়াছেন কি? কোনো নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তের পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারী রবীন্দ্রনাথ যে কখনো করেন নাই এ কথা হলফ্ করিয়াই বলিতে পারি, কিন্তু যে "পোষ্টমাষ্টার" এবং তাহার পার্শ্বচারিণী রতন তাঁহার হাতেই রূপায়িত হইয়া উঠিল বাংলা সাহিত্যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যে, তাহার জুড়ি মিলিবে কি? সেই জন্যই বলিতেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বাস্তবসাহিত্যের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু নয়; অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া এখন দেখা যাক্ আমাদের এই "রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্যের বাস্তবভিত্তি কতটুকু? শুধুই কি য়ুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদের কথা-সাহিত্যে নানা কাল্পনিক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছি, না আমাদের সমাজ-জীবনে সে সমুদয় সমস্যা সত্যই জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে? আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবি-সমস্যার একটা বাহিরের মিল হয় তো আবিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু য়ুরোপে যে ভাবে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে, এবং ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যকে স্তরে স্তরে রূপান্তরিত করিয়াছে, বাংলাদেশে সে সমস্যাগুলির প্রায় কোনটিরই কোনো বাস্তবভিত্তি

আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্যার মূল কারণ হয় তো দুই দেশেই এক, কিন্তু য়ুরোপে তাহা যে ভাবে ও যে ধারায় প্রকাশ পাইয়াছে আমাদের দেশে তাহা পায় নাই; অথচ য়ুরোপের ধারাই আমাদের দেশের ধারা ভাবিয়া আমরা সাহিত্যে তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছি!

কথাটা একটু খুলিয়া বলিলেই বুঝা যাইবে এবং তাহার সঙ্গে বাস্তব-সাহিত্যের আর একটা যে দিক আমাদের অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, নর-নারীর সেই যৌনসম্বন্ধের কথাও আসিয়া পড়িবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক য়ুরোপে Industrialism-এর যুগ। এই Industrialism-এর পশ্চাতে সেখানে নানা বিচিত্র সমস্যার সূত্রপাত ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধান-চেষ্টা দেখা দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও সে চেষ্টা বাদ যায় নাই। Industrialism-এর বৃদ্ধির ফলে সমাজে যে ধনী ও নির্ধনের ভেদ-বৈষম্য উগ্র হইয়া উঠিল, সমাজ-অঙ্গে অভাবে ক্লিষ্ট, দুঃখে ভারাক্রান্ত, অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ইন্দ্রিয়বিকারে কলুষিত যে এক নূতন স্তরের সৃষ্টি হইল, সেই স্তরের নর-নারীর জীবনের মধ্যে সমস্ত অন্তর দিয়া প্রবেশ করিয়া, সাহিত্যে সেই জীবনকে বেদনায় ও বিদ্রোহে চিত্রিত করিলেন এক দল শক্তিমান লেখক। এই দলের অগ্রণীগণই ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় "রিয়ালিষ্টিক" সাহিত্যের রচয়িতা। Industrialism-এর ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরো নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া জুটিল। Economic independence of women হইল তাহার প্রধান একটি। জীবিকা-সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী যখন স্ব-তন্ত্র ও স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইল, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আর তখন সে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন বোধ করিল না। কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশ যেখানে অবিচল, সেই রক্তমাংসের তাড়নায় তাহাকে পুরুষের দুয়ারে অতিথি হইতেই হইল, আর সে ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া সৃষ্টি হইল সমাজনিন্দিত যৌনসম্বন্ধ। পরে সেই যৌনসম্বন্ধই একটা স্বতন্ত্র সমস্যায় দাঁড়াইল। এই সমস্যা অত্যুগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে গত মহা-যুদ্ধের পর—যখন সমগ্র য়ুরোপে পুরুষের সংখ্যা ভয়াবহরূপে কমিয়া গিয়া উদ্বৃত্ত স্ত্রীলোকের বা Surplus women-এর সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের বাস্তবতা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নর-নারীর যৌনসম্বন্ধকে এতখানি আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু য়ুরোপের এই [illegible] সমস্যার অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের সম-

স্তার মিল কোথায় ? আমাদের দেশে নর-নারীর মধ্যে এই অসামাজিক যৌনসম্বন্ধ কখনই এত উগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই আর Economic independence of women বলিয়া কোন কথাই তো আমাদের সমাজ-জীবনে এখনও সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের দেশে Industrial problem ক্রমে সুকঠিন হইয়া দেখা দিতেছে সত্য, এবং হয় তো ক্রমে পশ্চিমের উদ্দাম সমাজ-জীবন আমাদের ভিতরও আসিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক যিনি, আর্টিষ্ট যিনি, তিনি যদি শুধু নূতনত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহারই অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলেন তাহা হইলে সুস্থ ও সত্য সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। আর পশ্চিমের বাস্তব-সাহিত্যে যৌনসম্বন্ধের যে রূপচিত্রণ অতি ঔৎসুক্যে আমাদের কথা-সাহিত্যে অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি তাহা কি শুধু আমরা সৃষ্টির আনন্দেই করিতেছি ? তাহার অন্তরালে কি ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই এবং তাহার কলুষ কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে না ? তাহা যদি না হইবে তবে হঠাৎ 'রজনী' যখন-তখন 'উতলা' হইয়া উঠিবে কেন, অথবা দেহের জন্য দেহ এমন করিয়া আকুল হইয়া ছুটিবে কেন ? কথা উঠিতে পারে—"এ তো আমরা মনগড়া কাল্পনিক কথা লিখিতেছি না, জীবনে যাহা নিত্য ঘটে, নিত্য ঘটিতেছে, তাহারই সত্যরূপ আমরা 'সাহস করিয়া' পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি,—নীতি-দুর্নীতির কোন কথাই তো ইহার মধ্যে আসিতে পারে না।"

শুধু নীতি-দুর্নীতির কথা আমিও তুলিতেছি না। আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী করি বটে ও সহরের স্বাস্থ্য-বিবরণ আমার জানা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা হইলেও আমি সাহিত্যের "স্যানিটারী ইনস্পেক্টার" নই, সে কাজের জন্য প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত রাজভৃত্য রহিয়াছেন, আমি শুধু আর্ট ও সাহিত্যের দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি। এমন এক সময় ছিল যখন Art for Arts' sake কথাটা ছিল একদল সাহিত্যিকের ধুয়া, এখন যেন হইয়াছে Sex for Sex's sake; কিন্তু Art for Art's sake যেমন আর্টের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না তেমনি শুধু যৌনসম্বন্ধের গল্প বা উপন্যাস কখনও সাহিত্যের সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে বাংলা দেশে রাজদ্বারে দণ্ডিত "বিবাহ-বিজ্ঞান" ও "স্ত্রীর পত্র" ও পশ্চিমের রাশি রাশি Pornography-র কেতাবও

নর-নারীর সমাজ-স্বীকৃত যৌনসম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-নিন্দিত যৌনসম্বন্ধও অতীতকালে ছিল, বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে তাহাকে লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসও হইয়াছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ পথে যিনি চলেন তিনি ক্ষুরধার দুর্গম পথের পথিক, প্রতি পদে তাঁহাকে সাবধান হইয়া চলিতে হয় ; এক চুল এ-দিক ও-দিক হইলেই তিনি সাহিত্য-স্রষ্টার আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। এ পথে যাঁহার লেখনী শঙ্কালেশহীন হইয়া ছুটিয়া চলে তিনি যে "দুঃসাহসিক" তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিব, কিন্তু তিনি লালসা বা ইন্দ্রিয়-বিকারের ছবি আঁকিতেছেন বলিয়াই যে আর্টের পূজারী বা সাহিত্যের স্রষ্টা তাহা বলিব কি করিয়া ? এই যৌনসম্বন্ধীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে আইনে দণ্ডনীয় কতকগুলি সমাজ-সংস্থান-বিরোধী ব্যাপারও আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের অতি রুচিকর উপাদান-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে ! ইহারও উদ্ভব আমাদের দেশে প্রথম হয় নাই। ডষ্টিয়ভেস্কি প্রমুখ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিক Criminology-কে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদের বাস্তব কথা-সাহিত্যের কতকটা জুড়িয়া তাহারই এক ব্যর্থ ও অসংযত অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। ডষ্টিয়ভেস্কির "Crime and Punishment" রাশিয়ার সমাজের এক অংশের একটি পরম শক্তিমান চিত্র, কিন্তু এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির কোথাও মানব-চিত্তের মাংসলোলুপতার কিম্বা পাপ-পঙ্কিল লালসার মনস্তত্ত্ব একান্ত হইয়া পাঠকের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া দেয় না, বরং সমাজ-জীবনের এই সুকঠিন সমস্যা সমবেদনা ও সহানুভূতিতে রূপায়িত এবং বুদ্ধি ও বিবেচনায় বিশ্লেষিত হইয়া চিত্তকে ভাবে ও ভাবনায় অভিভূত করিয়া দেয়। সেইখানেই বলিতে পারি আর্ট তাহার সার্থকতা লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"কেও একদিক হইতে যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধীয় উপন্যাসের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-দেহের রক্তমাংসের যে কামনা, সন্দীপের মধ্যে তো তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই কামনার ইন্ধনে পতঙ্গের মত আত্মাহুতি দিবার জন্য সন্দীপের বারম্বার আহ্বান তো বিমলাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু সন্দীপের এই অসংযত লালসার উগ্র বহ্নিশিখা কোথাও পাঠকের চক্ষুকে পীড়িত করে নাই, কেন না সর্ব্বত্র একটি পবিত্র সংযমের ঘৃতদীপশিখা সমস্ত লালসা-কামনার উপর অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আলোক সম্পাত করিয়াছে। সে আলোক সন্দীপের উদ্দাম লালসা ছাপাইয়া নিখিলেশের শান্ত-

দেয়। সাধারণ লেখকের কাছে অবশ্য এই আদর্শের পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না, কিন্তু যাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিব সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাঁহাকেই বাস্তব-সাহিত্যের উপযুক্ত লেখক বলিয়া অভিনন্দিত করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে তেমন একটি লেখকও আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। বাংলাদেশের লেখকেরা ভাবিতেছেন, আমাদের সমাজ-জীবনের আনাচে কানাচে যে পাপ ও অন্যায় নিত্য অভিনীত হইতেছে তাহাকেই হুবহু চিত্রিত ও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলেই বুঝি বাস্তব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। সেই জন্যই আর্টের মর্য্যাদা-রক্ষা অপেক্ষা পাঠকের কাছে বিবৃত ঘটনাকে রসালো করিয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে—লালসার ফেণিলোচ্ছ্বসিত উদ্দাম বিলাসশালায় নারী-মাংসলোলুপদের আমন্ত্রণের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামায়ণ বিরচিত হইতেছে! আমাদের লেখক-দিগকে এ কথা কে বুঝাইবে যে, ইহাই যদি সাহিত্যের রাজসভায় স্থান পাইতে পারে তাহা হইলে খবরের কাগজে পুলিস-কোর্টের এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সেই আসনের দাবী করিতে পারিবে না কেন? তাহাতে রোমান্সের অভাব নাই—প্রেম আছে, ঈর্ষা আছে, যৌনমিলনের বৈচিত্র্য আছে, এমন কি রক্তারক্তি, খুনাখুনী পর্য্যন্ত আছে—এবং তাহাকে ঘোরালো ও রসালো করিয়া তুলিবার জন্য "News of the World"-এর মত বিলাতী সাপ্তাহিকের চেষ্টারও অবধি নাই,—সে চেষ্টা এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে যে, পাশ্চাত্যদেশে আইন করিয়া বিবাহবিচ্ছেদের এইরূপ বিবরণ প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে,—কিন্তু যত রসালোই হউক আর যত রোমান্সই তাহাতে থাক্, সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায়?

বলিয়াছি, এবং সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের বাংলা নব-কথাসাহিত্য য়ুরোপের আধুনিক কথা-সাহিত্যের প্রভাব ও অনুকরণে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিদেশের মানুষকে ছাড়িয়া স্বদেশের কুকুরকে মাথায় করিব এমন উৎকট জাতীয়তা-বোধ আমার নাই কিন্তু ঘরের শুভ্র স্নিগ্ধ মাটির প্রদীপখানি নিভাইয়া বিদেশের যে অত্যুজ্জ্বল আলো, সহজেই যাহা চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয় এবং স্বাস্থ্যকে পীড়িত করে, তাহাকে ঘরে আনিয়া জ্বালাইবার পূর্ব্বে একবার কি বিচার করিয়া দেখিব না, কি ঘরে আনিতেছি, কেন

আনিতেছি? কিন্তু আমরা তাহা করি নাই, করিবার প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহার আপাত-মোহন রূপে, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহার নোবেল-প্রাইজের হীরকোজ্জ্বল তকমার সৌন্দর্য্যচ্ছটায়। সুইডেন হইতে রাজটীকা ললাটে পরিয়া যাহা বাহির হইল তাহাই হইল আমাদের কাছে "বিশ্বসাহিত্য!" কথা উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথও তো আজ সুইডেনের দৌলতেই জগৎ-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইয়াছেন, কিন্তু এ কথা মূঢ়দের কে বুঝাইবে যে, নোবেল-প্রাইজ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত হন নাই, রবীন্দ্রনাথে অর্পিত হইয়া নোবেল-প্রাইজই সম্মানিত হইয়াছে; সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সমকক্ষতা করিতে পারে, নোবেল-প্রাইজের সুদীর্ঘ তালিকাটিতে এমন একটি নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নোবেল-প্রাইজ শুধু রবীন্দ্রনাথকে বিদেশের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করিয়াছে মাত্র।

তরুণ-দলের কাগজপত্রে "বিশ্ব-সাহিত্য" কথাটা আজকাল খুব বেশী দেখা যায়, তাঁহাদের মুখে কথাটা শোনাও যায় খুব। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য জিনিষটা কি? তাঁহারা "Continental Literature"-এর অর্থ করিয়াছেন "বিশ্ব-সাহিত্য" ( Continent = বিশ্ব; Literature = সাহিত্য )। কিন্তু এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, য়ুরোপীয় সাহিত্য বলিয়াই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের আসন পাইতে পারে না, এমন কি নোবেল-প্রাইজের তকমা পাইলেও নয়। যে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে একটা ভাববিপুলতা নাই, রসে ও সৌন্দর্য্যে, প্রেরণায় ও অনুভূতিতে যাহা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বমানবের চিন্তা ও রসের উৎস-স্থানটিকে আঘাত করে না তাহা "Continental Literature" হইতে পারে কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য তাহা কিছুতেই নয়। য়ুরোপের আধুনিক কথা-সাহিত্য যদি আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তবে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা-কিছু Continental Literature তাহাই যদি তাঁহাদের মোহগ্রস্ত করিয়া থাকে তবে ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি সাহিত্যে স্বাদেশিকতার ওকালতী করিতেছি না; যে সাহিত্য জীবন্ত সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, বিদেশী সাহিত্যের সকল রকম বৈচিত্র্যের সহিত সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সকল দেশের সাহিত্যের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া সে তাহার [illegible] ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে, কোনপ্রকার সংকীর্ণ স্বদেশাভিমানের স্থান [illegible]

অতি-আধুনিক "Continental Literature"-এর মোহ আমাদের এই বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের কি ভাবে-দুর্ব্বল করিতেছে তাহা একটু বলা দরকার। কয়েকদিন আগে কোন সাহিত্য-রসিক বন্ধুর বাড়ীতে এক 'তরুণ' বন্ধুর সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ভিক্টর হুগোর 'Toilers of the Sea' পড়িয়াছ?" বন্ধু একটু উষ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "ভিক্টর হুগোর যুগ এখনও আছে নাকি?—এখন Continental Literature-এর যুগ; মেটারলিঙ্ক, রলাঁ, আনাতোল ফ্রান্স, ব্লাস্কো ইবানেজ, জাসিন্তে বেনাভেন্তো, হামসুন, বোয়ার, গর্কি, শেকভ্—ইঁহারাই এ যুগের লেখক, তাঁহাদেরই আমরা পাঠক।" শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই—কেননা ইতিপূর্ব্বেই আমার জানিবার অবসর ঘটিয়াছিল যে, "তরুণ"দলের অনেকেরই কাছে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কথা-সাত্যিকেরা নিতান্তই "সেকেলে" হইয়া পড়িয়াছেন এবং "Continental Literature"-'ফিরিস্তি' আওড়ানো এমন একটা 'ফ্যাসান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যাহার সে-রাজ্যের অলি-গলিতে ও আঁস্তাকুড়ে গতিবিধি নাই তারুণ্যের মধ্যে তাহার অবাধ অধিকার নিষিদ্ধ।. কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমি ভাবিয়া পাইলাম না, য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের Classics-এর সহিত যাহার পরিচয় নাই আধুনিক "Continental Literature"-এর সহিত তাহার পরিচয় এত সহজে কি করিয়া এত নিবিড় হইতে পারে; মূল হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন, শিকড় যাহার উৎপাটিত, সে বৃক্ষের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া কতটুকু রসের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে! য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের ঐতিহাসিক ধারাটিকে সমস্ত ভাববোধ দ্বারা যে অনুসরণ করিল না তাহার আধুনিকতম বিকাশ তাহার কাছে কি করিয়া সহজবোধ্য হইয়া উঠিল? থ্যাকারে, ডিকেন্স্ যে পড়িল না, সে মেরেডিথ্ ও হার্ডিকে বুঝিবে কি করিয়া? শেরিডানকে যে অনুসরণ করে নাই, বার্ণার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড-এর সূক্ষ্ম হাস্যরস, তীব্র শ্লেষকে সে উপভোগ করিবে কি করিয়া? টুর্গেনিভ, টলষ্টয়কে যে জানে না, শেকভ, গর্কি তাহার নিকট সহজ হইবে কেন? ব্যালজাক্, ভিক্টর হুগোর সহিত যাহার পরিচয় নাই, আনাতোল ফ্রান্স বা রম্যাঁ রলাঁর সহিত তাহার সৌহার্দ্দ্যের সম্ভাবনা কোথায়? য়ুরোপের Classical কথা-সাহিত্য হইল তাহার আধুনিক কথা-সাহিত্যের পটভূমি বা background; এই পটভূমির (background-এর) সহিত পরিচিত হইতে না

বর্ত্তমানের যোগ ও বৈষম্যের ধারাটিকে না বুঝিলে বর্ত্তমানকে স্বীয় স্বরূপে জানিতে পারা অসম্ভব। য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের ইতিহাস যুগে যুগে স্তরে স্তরে যে সঙ্গতি ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলে, তাহার রস ও সৌন্দর্য্যের ধারার ও সমস্যার অভিব্যক্তির ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে কিছুতেই তুলনায় আধুনিক সাহিত্যের সম্যক্ মূল্য নিরূপণ করা চলে না। সেই জন্যই আধুনিক য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্য পড়িতে গিয়া বাংলার তরুণেরা মুড়ি-মিছ্রীর একদর বাঁধিয়া দিল, বাংলার তারুণ্যের সমস্ত শক্তি দরাজ-হস্তে অপব্যয় হইয়া গেল—ঘরের কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ তো হইলই না বরং তাহা অজীর্ণতার উদ্গারে ভরিয়া উঠিল। য়ুরোপের কথা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য যদি বুঝিতে জানিতেও পারিতাম তাহা হইলে আমাদের নব-কথা-সাহিত্যে যে অভাব ও দুর্ব্বলতা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, হয় তো তাহা করিতে হইত না। নবতম য়ুরোপীয় সাহিত্যের যত রকমের বাহ্যরূপ, একটি একটি করিয়া প্রায় সব কয়টিই আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আমরা আমদানী করিয়াছি। কিন্তু সে রূপের পশ্চাতে অরূপের যে আভাস রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইলাম না, তাহার প্রাণের সন্ধান পাইলাম না বলিয়া আমাদের সৃষ্টি ব্যর্থ হইল।

বাংলাদেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের আব্‌হাওয়া কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির পক্ষে খুব অনুকূল নহে। পশ্চিম হইতে অনুকূল বাতাস আসিয়া যদি তাহার পালে হাওয়া লাগাইয়া দিকে দিকে তাহার যাত্রা সুরু করিয়া দিত তাহা হইলে বাংলার নব কথা-সাহিত্য হয় তো একদিন জগতের সাহিত্য-সঙ্গমতীর্থে আসিয়া তরী ভিড়াইতে পারিত। কিন্তু "Continental" কথা-সাহিত্যের মোহে আবিষ্ট হইয়া সে পথ বুঝি বা অবরুদ্ধ হইয়া গেল এবং শুধু এক প্রকার সৌখীন প্রেমের গল্প, নগ্ন যৌনলীলার গল্প, অথবা কলকারখানার কুলীমজুরের জীবনের বাহিরের দিক্‌টার গল্পই আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের সমস্তটুকু জুড়িয়া রহিল। দুঃখ এই যে, যে পথিক সুদীর্ঘ পথের যাত্রী, দৃষ্টির যাহার শেষ নাই, সীমা নাই, সে পথিক কলিকাতার কোন বিশিষ্ট সহরতলীর আশে-পাশেই ঘুরিয়া মরিল, না হয় বড়জোর একটু শিলং, দার্জ্জিলিং অথবা রাঁচী, হাজারীবাগে ঘুরিয়া আসিল; যাহাদের জ্ঞানের পরিধি সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গনে আবেষ্টন করিতে চায়, তাহাদের প্রতিদিনের জীবন ড্রইংরুমের চায়ের

মেয়ে-ইস্কুলের সু-উচ্চ প্রাচীর-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল! এই বৈচিত্র্যহীনতাই বাংলা কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির পথে সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন বাধা। এ জন্য অনেকাংশে দায়ী অবশ্য আমাদের বাঙালীজীবন। নানা কারণে বাংলা দেশের সমাজ-জীবন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ, মানুষের বিচিত্র শক্তি তাহার মধ্যে অবাধ লীলার অবসর পায় না এবং তাহার হৃদয় যে দিনে দিনে আপনাকে নব নব রূপে সৃষ্টি করিতে চায়, সেই সৃষ্টিপথে বাধা পাইয়া পাইয়া ভাব ও কল্পনা পঙ্গু এবং বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাবিমুখ হইয়া পড়ে। য়ুরোপের সাহিত্য যে বিচিত্র রসে ভরপূর তাহার কারণই হইতেছে তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন; স্বাধীন তাহাদের চিত্ত, জীবন তাহাদের নানাদিকে স্ফূর্ত্ত। তাহারা আমাদের মত মরিয়া বাঁচিয়া নাই, তাহাদের জীবনে adventure আছে, romance আছে; এ সব আমাদের কিছুই নাই। আমাদের দেশের তরুণ যাঁহারা তাঁহারা জীবনে রোমান্সকে কখনো ভাল করিয়া চেনেন নাই, কাজেই সুস্থ সত্য প্রেমের গল্পও বাংলার নব কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিল না। সেই জন্যই মনে হয় বাঙালীজীবন যতদিন না পৃথিবীর বিস্তীর্ণ উদার লীলা-ভূমিতে দিকে দিকে আপনার বিচিত্রশক্তিকে আনন্দে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে, বাংলার সমাজ যতদিন না কৃত্রিমতা ও মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছে, ততদিন বাংলা কথা-সাহিত্যের নবজীবন লাভ বুঝি আর হইবে না। এই নৈরাশ্যের কথাকে মন স্থান দিতে চায় না কিন্তু সে বুঝিতেছে এ কথা সত্য, ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই।

নৈরাশ্য আছে জানি, কিন্তু নৈরাশ্যের কথা আজ নাই বলিলাম। আজ না হয় পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশিকে "প্রাণরসের ফোয়ারা" বলিয়া আমরা আনন্দে অভিনন্দিত করিতেছি কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যেদিন সত্যই চারিদিক হইতে স্বচ্ছ, অনাবিল জলস্রোত আসিয়া আমাদের আবদ্ধ পঙ্কিল অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যধারার খাতে নূতন ধারা বহাইয়া তাহাকে রসে অভিষিক্ত, সৌন্দর্য্যে রূপায়িত ও শক্তিতে সঞ্জীবিত করিবে। আমাদের বর্ত্তমান "তরুণ" সাহিত্যিকেরা নন্—ভবিষ্যতে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়া যাঁহারা আসিতেছেন, যাঁহারা শুদ্ধ শুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিক-পত্রিকার সহজ সম্মানে লুব্ধ হন নাই, যাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে শুধু রক্তমাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ

বেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিবেন—আমরা তাঁহাদের আগমন-আশায় অপেক্ষা করিতেছি, বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তাঁহাদের আমরা পূর্ব্বাহ্নেই অভিনন্দিত করি; তাঁহারা আসিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যকে ক্লেদ-পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাদের স্পর্শে সমস্ত প্রগল্‌ভ কল্লোল নীরব হউক, ঝরণার পঙ্কিল আবর্ত্তন স্তব্ধ হউক, কালি-কলমের কলঙ্ককালিমা শুভ্র শুচিতায় স্নিগ্ধ হউক,—সেই শুভদিনকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রা শুরু হউক, বাংলা-সাহিত্যের যিনি দেবতা, যিনি কর্ণধার, তাঁহার বন্দনা-গানে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠুক—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

---

প্রকাশক—শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম, এ, ৯১।১-এন্ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।